160

দৈনিক ইত্তেফাক

045

তারিখ 13 NOV 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 কলাম 3 ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

13 NOV 1988

স্থান-কাল-পাত্র

লুব্ধক

এইচ এস সি হোক বা এস এস সি হোক, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর তা নিয়ে কিছু লেখাটা এদেশে একটা রেওয়াজ। সফল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন এবং বিফল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছুটা সমবেদনা, কিছুটা ক্ষোভ ও হতাশা—এটা শুধু পারিবারিক বা সামাজিক আচারে নয়, পত্র-পত্রিকার লেখাতেও দৃশ্যমান। সেই সাথে পরীক্ষা পদ্ধতি, স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার মান ও পরিস্থিতি—সর্বোপরি ছাত্র ও শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলাটাও সেই রেওয়াজের অন্তর্ভুক্ত।

এতে কিছুই হয় না। কিছু হওয়ারও নয়। এদিকে 'পাসের' বাড়ীতে যেমন আনন্দ-উল্লাস, তেমনি 'ফেলের' বাড়ীতেও বিষাদের বেদনা। এমনও দেখা যায়, একই বাড়ীতে এক ছেলে কিংবা মেয়ে পাস করেছে, আরেক ছেলে বা মেয়ে পাস করতে পারে নাই। সে বাড়ীতে আনন্দের সাথে বেদনার মিশ্রণ পরিবেশকে ভিন্নতর করে তোলে। কোন কোন বাড়ীতে পরিবেশের আরো ভিন্নতা ঘটে—যখন ফেলকরা ছাত্র-ছাত্রী অভিমানে কিংবা লজ্জায় আত্মহননের প্রয়াস পায়। কোন কোন বাড়ী থেকে আবার ফেলকরা ছাত্র হয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ।

প্রতিবারেই এসব ঘটনা ঘটে এবং এবারের এইচ এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের পরেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। দেখা যাচ্ছে এবারের ৪টি বোর্ডে সর্বমোট ২ লাখ ৯৭ হাজার ১২০ জন পরীক্ষার্থী এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন। পাসের হার শতকরা ৪৪'১০ জন। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীই ফেল করেছে।

অবশ্য গড় হিসাবের ফাঁক ও ফাঁকি শুধু এইটুকুই নয়। যেমন ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ছিল শতকরা ৫৭ দশমিক ৭৫; কুমিল্লা বোর্ডে ৫১ দশমিক ৭০; রাজশাহী বোর্ডে ৩৪ দশমিক ৬২ এবং যশোর বোর্ডে পাসের হার মাত্র ২৮ দশমিক ৭৯ জন। দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বোর্ড ও কুমিল্লা বোর্ডের ফলাফল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। কিন্তু রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, ছাত্র হিসাবে তারা কি এতই খারাপ ছিল? যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য দায়ী কে? ছাত্র? শিক্ষক? সংশ্লিষ্ট বোর্ড? না পরীক্ষা পদ্ধতি? নাকি সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহ?

এই মুহূর্তে আমরা কোন বিশেষ পক্ষকে দায়ী করতে চাই না। অবশ্য অনেকের মত এই বলেও আমরা সান্ত্বনা খুঁজতে রাজী নই যে, পাস যারা করেছে, ভর্তির জন্য তাদের পেরেশানির অন্ত থাকবে না, সেই হিসাবে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা বেঁচে গেছে। আমরা এই ধারণাও পোষণ করতে রাজী নই যে, ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পূর্ণ নিজেদের দোষেই ফেল করেছে। ফেলের জন্য অবশ্য তারা নিজেরাও কম দায়ী নয়। এদের অনেকেই যে সারা বছর লেখাপড়া বাদ রেখে, কখনো আড্ডা দিয়ে, কখনো ভিন্ন কোন পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গিয়ে ফেল করে নাই, সেকথা জোর দিয়ে বলার উপায় নাই।

এদিকে বহু অভিভাবকও এ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁরা ঘর-সংসার, চাকুরী ও অন্যবিধ কাজ ঠিকভাবেই সম্পন্ন করে গেছেন, কিন্তু নিজ নিজ পোষ্যদের লেখাপড়ার দিকে তেমন মনোযোগ দেন নাই। অন্যদিকে যে সব কলেজে ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় ফেল করেছে সে সব কলেজের হর্তাকর্তা, বিশেষতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এ বিষয়ে অনেক বেশীভাবেই দায়ী এবং দোষী।

বলা অনাবশ্যক যে, এইসব ছাত্র-ছাত্রীর এবং তাদের অভিভাবকদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারীভাবে প্রদত্ত বেতন-ভাতা নিয়েই ওইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা দিন গুজরান করে থাকেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে পড়ানোর দায়িত্বটুকু তাদের দ্বারা পালন সম্ভব হয় না।

তাছাড়াও অভিযোগ উঠেছে যে, এমন ধরনের কলেজও এদেশে রয়েছে—যেসব কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করেছে বটে, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের বেশীরভাগই হয় নিজেদের চেষ্টায় কিংবা প্রাইভেট পড়ে পাস করেছে; কলেজের শিক্ষকদের কৃতিত্ব সেখানে নাই বললেই চলে।

এখানেই আসে শিক্ষা পদ্ধতির কথা। এই মান্ধাতা আমলের শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির দরুন ছেলে-মেয়েরা সারা বছর না পড়েই একলাফে পরীক্ষায় পাস করতে চায়। পরীক্ষা পাসের জন্য নকল ও অসাধু পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনকি এদের সাথে বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর যোগসাজশের অভিযোগও কম নয়।

আগেই বলেছি, পরীক্ষার পাস-ফেলকে সামনে রেখে রেওয়াজ মোতাবেক এসব কথা আগেও বহুবার বলা হয়েছে। অবশ্য বলে যে লাভ হয় নাই, তা এই ৪ বোর্ডের বেশীরভাগ ছেলে-মেয়ের ফেল দেখেই বুঝা যায়। সবচেয়ে খারাপ লাগে, যখন অভিযোগ শুনি, যারা পাস করেছে, তাদের বেশ কিছু সংখ্যক নাকি নকলের মাধ্যমে এবং তদ্বিরের জোরেই উৎরে গেছে।

এইসব অভিযোগের ভগ্নাংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরেই নিতে হবে যে, শিক্ষার নাম করেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করার জন্য বুঝেই হোক বা না বুঝেই হোক, এক দল লোক উঠে-পড়ে লেগেছে। এবিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা শুধু ব্যক্তিজীবনে তথাকথিত পাসের তকমা এঁটেও জাতীয় জীবনের ফেল এড়ানো যাবে না।

আর একটা মানসিকতা এই প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। তাহল, কে বা কারা যেন কর্তাব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন যে, এদেশে উচ্চশিক্ষার তেমন প্রয়োজন নাই—এস এস সি বা এইচ এস সি'র পর ছাত্রদের টেকনিক্যাল লাইনে দিলেই দেশ ও জাতি উদ্ধার পাবে। কথাটা সত্যি হত—যদি দেশের সব না হোক, বেশীর ভাগ লোক শিক্ষিত হত।

কিন্তু এদেশের শিক্ষার হার বিশ বলি আর বাইশ বলি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তুলনা করলে আমরা মোটেও এগুচ্ছি না বরং পিছিয়ে রয়েছি যোজন দূরে। সেই অবস্থায়, যারা পড়াশুনা করছে, টেনেটুনে সেকেণ্ডারী কিংবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত উঠছে, তাদের স্কুলের আর কলেজের লেখাপড়ার মান যদি এই হয়, তাহলে জাতি হিসাবে আমরা দাঁড়াব কোথায়?

যাহোক, শোনা যাচ্ছে, কর্মকর্তারা অতঃপর আগামীতে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কথাটা গভীরভাবে বিবেচনা করছেন। লেখাপড়া একটা সামগ্রিক ব্যাপার। সেখানে লেখাপড়ার পরিবেশ, পাঠ্য-পুস্তক, শ্রেণী শিক্ষা, পরীক্ষা কোনটাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর কোন একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটার উপরে জোর দিলে যে হয় না, সেটা পরীক্ষার নকলবাজি আর ফেলের হিড়িক দেখেই বুঝা উচিত।

এটা এই জন্যই হচ্ছে যে, পরীক্ষার সার্টিফিকেটকেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট মোক্ষ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেনতেন প্রকারে সার্টিফিকেট জোটানোই তাই এখন সকল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কথাটা শুধু যে 'কথার কথা' নয়, সেটাই একাজটা করার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের অবশ্যই বুঝতে হবে।